জ্ঞানগঞ্জ মাসিক পুথি ১৮ ।। মৃদুল কুমার বাগচী স্মৃতি পুথিমালা

প্রাক্-ঔপনিবেশিক অধরা বাংলা গদ্য: একটি অন্বেষণ

অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্ঞানগঞ্জ,
উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা

জ্ঞানগঞ্জ মাসিক পুথি ১৮ ।। মৃদুল কুমার বাগচী স্মৃতি পুথিমালা ।। নভেম্বর ২০২৪ ।। অগ্রহায়ন ১৪৩১

প্রাক্-ঔপনিবেশিক অধরা বাংলা গদ্য: একটি অন্বেষণ - অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়
Prak-Ouponibeshik Odhora Bangla Godyo : Ekti Onweshon - Arjun Bandyopadhyay

১৭৭০/১১৭৬ *গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন* ।। *জনভাণ্ডার* ।। *অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম*।। *বই প্রকাশ পরিকল্পনা*।। *গ্রন্থাগার* প্রকল্পের অধীনে জ্ঞানগঞ্জ ।। উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, ৪ হিদারাম ব্যানার্জী লেন, কলকাতা - ৯ পক্ষে প্রকাশনা করলেন বিশ্বেন্দু নন্দ, অত্রি ভট্টাচার্য

ছাপা বাঁধাই আনন্দগোপাল হালদার, দেবাইপুকুর রোড, হিন্দমোটর, হুগলী

দাম ৫০ টাকা

কপিরাইট-মুক্ত প্রকাশনা

‘পাঠক, জানিবে রূপ, স্বাস্থ্য ও যৌবন ও রীতিভঙ্গ করিবার সবল সাহসে কিয়ৎ পরিমাণে দেবত্ব থাকে’
- ফ্রাইডে আইল্যান্ড, অমিয়ভূষণ মজুমদার

একটি ভাষার উৎস, প্রাক-ইতিহাস, আদিযুগ তার সামাজিক রাজনৈতিক ভবিতব্যের নির্ধারক। বাঙলা ভাষায় গদ্যরচনার ইতিবৃত্তও তার ব্যতিরেকে নয়। প্রাক-যুগের আদি-ইউরোপীয় বাঙলাগদ্য লেখনীর প্রণেতা মানোএল দ্য আসসুমচাও, হ্যালহেড, ফর্স্টার প্রমুখ থেকে শ্রীরামপুর মিশন, উইলিয়াম কেরি, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত ও মুন্সি থেকে বিদ্যাসাগর, রামমোহন, বঙ্কিম অবধি যে বাহিত যে বাঙলাগদ্যের ধারাপাত তাকে সর্বজনমান্য দেবেশ রায় চিহ্নিত করেছিলেন ‘আরোপিত ধারাবাহিকতা’ নামে। তার মতে এই ‘আরোপে’র রাজনৈতিক গঠনতন্ত্রটি ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের খুঁটিপুজোর জন্য নির্মিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল দ্বিমুখী, প্রথমত ‘সিভিলিয়ানদের ভেতর অধীনস্থ দেশের ভাষা সম্পর্কে কিছুটা পরিচিতির পরিবেশ তোলা’ এবং, দ্বিতীয়ত ও মুখ্যত উপনিবেশিত ভূমিতে ‘শাসনব্যবস্থার সম্প্রসারণে দেশের অনেক গভীর পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি ও সংগঠন’কে নিয়ে যাওয়া। উপনিবেশ পূর্ব সময়ে ‘লেখ্য’ ও ‘বাক’ এর যে শ্রেণীগত তফাত, যে জ্ঞানতাত্ত্বিক দূরত্ব অথবা প্রয়োজনমতো নৈকট্য তাকেই দুমড়ে মুচড়ে ছাপাখানা-প্রসূত যন্ত্রপুঁজির গর্ভে এই নব্য বাঙলা গদ্যের জন্ম। যেখানে সভ্যতার দিকচিহ্ন ‘লেখা’ এবং ‘বাকরীতি’র কোনো সার্বভৌমত্ব, কোনো

বহুবাচনিকতা নেই, ছাঁচ রয়েছে, রয়েছে কেবল একটি সমসত্ত্ব আদল।

অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত সমসময়ের জরুরী গদ্যশিল্পী, এই প্রকল্প বিরোধিতাকল্পেই ক্ষুদ্রায়তন পুস্তিকাটি রচনা করেছেন। দেবেশ রায় যে অর্থে উপনিবেশপূর্ব বাংলায় স্মার্ত-নৈয়ায়িক পারম্পরিকতার সঙ্গে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের আলাপ পরিলক্ষিত করেছিলেন, আগ্রাসী উপনিবেশের সাংস্কৃতিক প্রকল্পনায় প্রত্যক্ষ করেছিলেন ‘শব্দ’ ও ‘অর্থে’র বিপর্যয়, এমনকি বলেও ছিলেন ইংল্যান্ড থেকে আমদানি করা শাসনতান্ত্রিক সংসদীয় পরিভাষাগুলির ‘কোনো শব্দই ভারতীয় সমাজবিকাশের অভিজ্ঞতা থেকে তৈরী হয়নি’- তারই অর্থান্তরে অর্জুন বাঙলা গদ্যকে খুঁজেছেন বৈষ্ণব সাধনমার্গের গুহ্যতত্ত্ব সম্বলিত অনাম্নী পুঁথিতে, চম্পূতে। যে বৈপ্লবিক প্রত্যয়ে দেবেশ রায় বলেছিলেন, ‘ইংরেজরা ভারতবর্ষকে প্রথম যে ভাষায় সম্বোধন করছে তা তার শিল্প সাহিত্যের ভাষা নয়, ব্রিটিশ ব্যুরোক্রেসির দক্ষ পরিভাষা।’ সেই প্রত্যয়েই অর্জুন, সুকুমার সেনের চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজকে প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলাগদ্যের উপাত্ত হিসাবে স্বীকার না করার জ্ঞানতাত্ত্বিক ভণ্ডামির দিকে আঙুল তুলেছেন। উপনিবেশ চায় উপনিবেশিতকে বিস্মরণে মজিয়ে রাখতে, এহেন সামাজিক - স্মৃতিবিভ্রাট আদপে তত্ত্ববিশ্বে বহুআলোচিত ‘কালচার অফ সাইলেন্স’কেই প্রণোদনা জোগায়। উপনিবেশ-বিরোধী চর্চা কর্পোরেট-বিরোধী চর্চার সকল কর্মীই, অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ সেই নীরবতা ভাঙার জন্য। আশা করি, এই পুঁথিটি বাঙালি পাঠকের পাথেয় হবে।

উপনিবেশের পতন হউক।
প্রাক-ঔপনিবেশিক ভাষাবৈচিত্র্য দীর্ঘজীবী হউক।

জ্ঞানগঞ্জের পক্ষে
অত্রি ভট্টাচার্য

প্রাক্-ঔপনিবেশিক অথবা বাংলা গদ্যঃ একটি অন্বেষণ

অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়

১

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, উনিশ শতকে সংস্কৃতের হাতুড়ি পিটিয়ে যে-বাংলা গদ্য সাহিত্য তৈরি হচ্ছিল, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাকে বলা যায়, 'সাহেব-পণ্ডিতের যোগসাজশ'। ঔপনিবেশিকতার এই অস্বস্তিকর উত্তরাধিকার সূত্রেই আমরা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রচেষ্টাকে গদ্য-ইতিহাসের প্রথম ক্রান্তিচিহ্ন বলে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি এবং প্রাচীনতর গদ্যের আলোচনায় কতিপয় মাত্র উদাহরণ উদ্ধৃত করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আমাদের গদ্য ছিল, কিন্তু সে যৎসামান্য এবং তার কোনেও মহিমা ছিল না। মুদ্রণশিল্পের প্রসার ও পত্র-পত্রিকার প্রচার উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম থেকেই গদ্যচর্চাকে এমন বহুমুখী, কোলাহলমুখর করে তুলেছে যে, পূর্ববর্তী গদ্য সাধনার দিকে দৃষ্টি ফেরাতে আমরা ভুলে যাই। আমার এই আলোচনায় এই শৈথিল্য অপনোদনের চেষ্টা

আছে। আমি পেছনের দিকে ফিরে চাইছি।

কোচ রাজা মল্লদেব, যিনি নরনারায়ণ নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন, ষোড়শ শতকের পাঁচের দশকে, ১৪৭৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৫৫-৫৬ নাগাদ, তিনি একটি চিঠি লেখেন অহোমরাজ স্বর্গনারায়ণ চুকাম ফা-কে। তখন কোথায় ইংরেজ, কোথায় ওলন্দাজ। অথচ তখনই গড়ে উঠছে বাংলা গদ্যের রূপ। মিশনারিদের হাতে নয়। এদেশেরই মানুষের হাতে, এমনকি রামমোহন বিদ্যাসাগরেরও অনেক আগে। ইংরেজি গদ্য থেকেই অনেক কিছু নিয়ে ঊনিশ শতক থেকে বর্তমান কালের বাংলা গদ্য তার গঠন ও পরিণতি পেয়েছে, এ-কথা ঠিক, কিন্তু তারও আড়াইশ বছর বা তারও আগে, ইংরেজরা আসার আগে এবং ইংরেজি সাহিত্যের সাথে পরিচয়ের আগেও যে এ-দেশে এ-ভাষায় নিজস্ব গদ্য ছিল, তার প্রমাণ এই চিঠি। ইউরোপীয় মিশনারিদের হাতেই বাংলা গদ্যের জন্ম হয়েছে, আমাদের দেশের ইতিহাসবেত্তাদের এই তত্ত্বনামাটি যে কতখানি ঐতিহাসিক রসিকতা তার প্রমাণ ব্রিটিশপূর্ব যুগের এই চিঠিপত্রগুলি। সেইসময়ে অসম, কাছার, মণিপুর, ভুটান ও কোচবিহারের রাজারা পরস্পরকে চিঠি লিখতেন অসমীয়া, কামতাপুরী, সংস্কৃত, বাংলা ও ফারসি মিশ্রিত এই ভাষাতেই। স্থলপদ্মের মতো গম্ভীর, স্মিত সালঙ্কারা সৌকর্যের এই চিঠির ভাষার কাছে নতজানু হয়ে বসে থাকি।

"...তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্চা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত

হইলে উভয়ানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্তব্যে সে বর্দ্ধিতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক।...''

এই ভাষা স্থাপত্য তো একদিনে গড়ে ওঠেনি। এমন তো আর নয় যে, মহারাজা নরনারায়ণ এক সকালে ঘুম থেকে উঠে এই চিঠি লিখে ফেললেন। এ এক আবহমান, চলিষ্ণু স্রোত। বিরাট এক ভূখণ্ডে যে স্রোত একদা তার নাব্যতা খুঁজে নিয়েছিল। নরনারায়ণ সেই ধারারই এক প্রামাণ্য ঢেউ।

কত না দিক থেকে বাংলা ভাষা জোয়ারের জল ছেঁচে তার ভাঁড়ারে তুলে এনেছে নতুন নতুন সম্পদ। শুধু কি কামতাপুর? দক্ষিণ রাঢ়ভূমির সুফি খাঁ, ইসমাইল গাজি, শাহ গরিবুল্লাহ, হাজি মোহাম্মদ, শেখ চান্দ, ফকির মহম্মদ– এঁদের নিয়ে গড়ে উঠেছে পীর সংস্কৃতি। বখতিয়ার খলজির বাংলাদেশ জয়ের পর সহজিয়া আর সুফির সমন্বয়ে এক অভূতপূর্ব বাংলাভাষার সৃষ্টি হচ্ছে তখন। মুসলমান তুর্কিরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা তুর্কিতে চালালেও রাজদরবার তো চলত ফারসিতে আর ধর্মাচরণ আরবিতে। ভাষা তার গতি নিল এইখানে। দরবারের লোকেদের সাথে বাংলার সাধারণ মানুষের যত ঘনিষ্ঠতা হচ্ছে ততই বাংলায় মিশে যাচ্ছে আরবি, ফারসি। তৈরি হচ্ছে মিশ্ররীতির এক ভাষ্য। ভেতর থেকে শাবলের চাড় দিয়ে উঠে মাটির উপরিতলের শিলাস্তর ফাটিয়ে বেরিয়ে আসছিল ভাষার এক নিজের গতি।

প্রায় ৩০০ বছরের প্রাচীন একটি গদ্যপুঁথি 'বৃন্দাবনলীলা'। তার একটি অংশ পড়ি চলুনঃ

''...তাহার উত্তরে এক পোয়া পথ চারণ পাহাড়ী পর্ব্বতের

উপরে কৃষ্ণচন্দ্রের চরণচিহ্ন ধেনুবৎসের এবং উঠের এবং ছেলির এবং মহিশের এবং আর আর অনেকের পদচিহ্ন আছেন। যে দিবস ধেনু লইয়া সেই পর্ব্বতে গিয়াছিলেন সে দিবস মুরলির গানে যমুনা উজান বহিয়াছিলেন এবং পাষাণ গলিয়াছিলেন সেই দিবস এই সকল পদচিহ্ন হইয়াছিলেন। গয়াতে গোবর্দ্ধনে এবং কাম্যবনে এবং চরণ পাহাড়েতে এই চারি স্থানে চিহ্ন এক সমতুল ইহাতে কিছু তরতম নাঞ্রী। চরণ পাহাড়ের উত্তরে বড় বেস শাহি তাহার উত্তরে ছোট বেস শাহি তাহাতে এক লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা আছেন তাহার পূর্ব্ব দক্ষিণে সেরগড়। গোপীনাথজীর ঘেরার দক্ষিণ পশ্চিম নিধুবন চতুর্দ্দিগে পাকা প্রাচীর পূর্ব্বপশ্চিমা বন পশ্চিমদিগের দরওয়াজা কুঞ্জের ভিতর জাইতে বামদিগে এক অটালিকা অতি গোপনিয় স্থান অতি কোমল নানান পুষ্প বিকশিত কোকীলাদি নানান পক্ষী নানান মত ধ্বনি করিতেছেন বনের শৌন্দর্য্য কে বর্ণন করিবেক। শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যে মহন্তের ও মহাজনের ও রাজাদিগের বহু কুঞ্জ আছেন। নিধুবনের পশ্চিমে কিছু দূর হয় নিভৃত নিকুঞ্জ যে স্থানে ঠাকুরাণীজী ও সখি সকল লইয়া বেশবিন্যাষ করিতেন। ঠাকুরাণীজীউর পদচিহ্ন অদ্যাবধি আছেন নিত্য পূজা হয়েন।...” (বানান অপরিবর্তিত)

সূত্র বা উৎস উল্লেখ না করে ছেড়ে দিলে অনেকেই বলবেন, এ কমলকুমার মজুমদারের লেখা। লক্ষ করুন এই গদ্যে অচেতন পদার্থগুলির প্রতি কী গভীর সম্মানসূচক ক্রিয়াপদ। পদচিহ্ন, যমুনা, পাষাণ, কুঞ্জ—এদের প্রতি যে শ্রদ্ধার ভঙ্গি, এই স্ট্রাকচার আমাদের ছিল। প্রকৃতির সঙ্গে এরকম রিলেশনশিপ, এ আমাদের নিজস্ব সৃজন। নিজেদের অর্জন। যেমন সংকীর্তন আমাদের নিজের। ‘নানান পুষ্প বিকশিত কোকীলাদি নানান

পক্ষী নানান মত ধ্বনি করিতেছেন’, এই নির্মাণ হারিয়ে ফেলল জাতি। অথবা, আরও পিছিয়ে গেলে, সাড়ে পাঁচশ বছর আগে কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের অহোম রাজ চুখাম ফাকে লেখা সেই চিঠির ভাষা, ‘অহন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে’। এটা তো একদিনে হয়নি। অষ্টাদশ শতকে (১৭৬৫ নাগাদ) এক মামা (কোনও রাজা-উজির বা লেখক-কবি নন, এক সাধারণ মানুষ) তাঁর ভাগ্নেকে চিঠিতে লিখছেন, ‘মোম বিসয়ে মনজোগ তব নাস্তি’ (বানান অপরিবর্তিত)। কীভাবে হল এটা?

দীনেশচন্দ্র সেন, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে লিখছেন, ‘অনেকেই হয়ত জানেন না যে বাঙ্গলা ভাষায় দুই তিন শত বৎসর পূর্বে অনেকগুলি যাত্রার পালা রচিত হইয়াছিল, এই পালাগুলির মাঝে মাঝে গান থাকা সত্ত্বেও সেগুলি মূলতঃ গদ্যেই লিখিত হইয়াছিল। যাঁহারা মনে করেন, ইংরেজীর অনুকরণে আমরা নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাঁহারা এই যাত্রার পালা-সাহিত্যে প্রবেশ করিলে বুঝিতে পারিবেন, ঠিক বিলাতী আদর্শে রচিত না হইলেও নাটকের ধরনের লেখার সঙ্গে বাঙ্গালীরা খুবই পরিচিত ছিলেন। এছাড়া রূপকথা ও গীতি-কথা খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল, তাহা মুখে মুখেই চলিয়া আসিয়াছে, লিখিত আকারেও তাহাদের নিদর্শন একেবারে দুষ্প্রাপ্য নহে।

সহজিয়া সাহিত্য অতি প্রাচীন এবং বিপুল, নিত্যানন্দ প্রভুর পর হইতে কত যে গদ্য-পদ্যময় সহজিয়া পুঁথি লিখিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। প্রত্যেক বৈষ্ণব বাবাজীর ঝুলি পরীক্ষা করিলে এই সাহিত্যের নমুনা কিছু না কিছু পাওয়া যাইবে।’

দীনেশচন্দ্র সেন এই কথা লিখছেন আজ থেকে প্রায় নব্বই বছর আগে। এখন কথা হল, প্রাচীন পদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে প্রচুর উপাদান থাকলেও প্রাচীন গদ্য বিষয়ক মালমসলার যথেষ্ট অভাব। আর যা কিছু পাওয়া গেছে সেগুলোও ইতিস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। কাজেই সাধারণের সহজলভ্য নয়। অনেকে সেসবের সন্ধানও জানেন না।

ইংরেজ শাসনের পূর্বে এদেশে কোনও গদ্য গ্রন্থকার ছিলেন না তা সত্য নয়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস অধিকাংশ গীতি রচনা করলেও দু-চারটি গদ্যও লিখেছেন। গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস রচিত গদ্য-রচনা পাঠ করেছিলেন। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতি বন্দনাস্থলে লিখেছেন–

যত যত রস-পদ করলহি বন্ধে
কোটি হি কোটি শ্রবণ পরপাইয়ে
শুনইতে আনন্দে লাগই ধন্দে।।
সোরস শুনি নাগর বর-নারী
কিয়ে কিয়ে করে চিত চমকয়ে ঐহন
রসময় চম্পূ বিথারি।

চম্পূ শব্দের অর্থ গদ্য-পদ্যময় কাব্য। তাহলে বেশ বোঝা যাচ্ছে, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতি প্রণীত গদ্যপদ্যময় কাব্য পাঠ করেছিলেন। বৈষ্ণব কবি বৈষ্ণবদাস লিখেছেন–

জয় জয়দেব কবি নৃপতি শিরোমণি
বিদ্যাপতি রসধাম
জয় জয় চণ্ডীদাস রস শেখর
অখিল ভুবনে অনুপাম

যাকর রচিত মধুর রস নিরমল
গদ্যপদ্যময় গীত
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র আস্বাদিল
রায় স্বরূপ সহিত।

এতে বোঝা যাচ্ছে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস পদ্যের মতো অনেক গদ্যও রচনা করেছিলেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যেমন বঙ্গভাষার আদি পদ্য লেখক, তেমনই তাঁরা এই ভাষার আদি গদ্য লেখকও।

এবারে আমি প্রায় পাঁচশ বছর আগে রূপগোস্বামী 'কারিকা' নামে যে গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন সেখান থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। পুস্তকটির প্রারম্ভ বাক্য এই প্রকার—

'শ্রীশ্রীরাধা বিনোদ জয়। অথ বস্তু নির্ণয়। প্রথম শ্রীকৃষ্ণের গুণ নির্ণয়। শব্দগুণ গন্ধগুণ রূপগুণ রসগুণ স্পর্শগুণ এই পাঁচ গুণ। এই পঞ্চগুণ শ্রীমতী রাধিকাতেও বসে। শব্দগুণ কর্ণে গন্ধগুণ নাসাতে রূপগুণ নেত্রে রসগুণ অধরে স্পর্শগুণ অঙ্গে। এই পঞ্চগুণে পূর্ব্বরাগের উদয়। পূর্ব্বরাগের মূল দুই। চিত্র দর্শন ও অকস্মাৎ বংশী শ্রবণ।'

তো যেটা বোঝা যাচ্ছে, বাংলা ভাষায় গদ্য রচনার উৎপত্তি ব্রিটিশ রাজত্বের অনেক আগেই হয়েছে। রমাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ লেখা হয়েছে প্রায় আটশো বছর আগে। চণ্ডীদাসের চৈত্যরূপ প্রাপ্তির বয়স প্রায় ছ'শো। অনেকে বলেন রামমোহনই বাংলা ভাষার প্রথম গদ্যলেখক, তা যথার্থ নয়। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস তো বটেই, এঁদের পরবর্তী রূপগোস্বামী প্রমুখ চৈতন্যসহচরগণ পদ্যের মতো গদ্যেও অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রতাপাদিত্য

চরিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র, রাজাবলী, প্রবোধচন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রামমোহনের আগেই রচিত হয়। হরনাথ রায় রামমোহনের আগেই সংস্কৃত পুরুষ পরীক্ষার বাংলা গদ্যে অনুবাদ করেন।

প্রায় নব্বই বছর আগে জহরলাল বসু তাঁর 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস' বইতে জানাচ্ছেন, অধুনা সহজিয়া সম্প্রদায়ের বহু বৈষ্ণব কবি রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গদ্য পুস্তিকা পাওয়া গিয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, 'রিসেন্ট রিসার্চেস হ্যাভ মেড ইট ক্লিয়ার দ্যাট বেঙ্গলি প্রোজ ওয়াজ এক্সট্যান্ট ইভেন ইন দ্য টেন্থ সেঞ্চুরি এ.ডি।'

ন্যায় শাস্ত্র বা তর্ক শাস্ত্র বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র বাংলা গ্রন্থ রয়েছে। এর ভাষা ছিল এরকম–

'গৌতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদিগের মুক্তি কী প্রকারে হয়? তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গৌতম উত্তর করিতেছেন। তাবৎ পদার্থ জানিলেই মুক্তি হয়। তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন পদার্থ কহো? তাহাতে গৌতম কহিতেছেন। পদার্থ সপ্ত প্রকার। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, অভাব। তাহার মধ্যে দ্রব্য নয় প্রকার।'

পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র রচিত 'কীর্তিলীলা' নামের একটি পদ্য গ্রন্থে দেখা যায়, রাধাবল্লভ শর্মা নামে একজন পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত যাবতীয় হিন্দু আইনের বঙ্গানুবাদ করেন।

এখানে যেটা বলার, পদ্য দেখে ভাষার অবস্থা ভালো রকম বিচার করা যায় না। কারণ প্রদ্যে যেসব কথা ব্যবহৃত হয়, সাধারণ

কথোপকথনে লোকে তার অনেক কথা প্রায় ব্যবহার করে না। কাজেই কোনও ভাষার বিষয়ে বিবেচনা করতে হলে পদ্য গ্রন্থের ওপর নির্ভর না করে গদ্য গ্রন্থের দিকেই দৃষ্টিপাত করা বেশি দরকার।

আমরা এখন দেখব প্রায় আটশ বছর আগে রমাই পণ্ডিতের লেখা 'শূন্য পুরাণ'-এর ভাষা কেমন ছিল।

'পচ্চিম দুআরে কে পণ্ডিত। সেতাই যে চারিসঅ গতি আনি লেখ্যা। চন্দ্র কোটাল যে বসুয়া ঘটদাসী। দুত নাহি ডরাই তুন্মাকে দেখিআ। চিত্রগুপ্ত পাঁজি পরিমাণ কর এ দুত জমর বিদ্যমানে।'

আগে প্রাচীন বাংলা গদ্য সাহিত্যের নমুনা খুঁজতে গেলে রামরাম বসু-র 'প্রতাপাদিত্য চরিত' (১৮০১) 'লিপিমালা' (১৮০২) প্রভৃতি পুস্তককে প্রাচীনতম বলে মনে করা হত। কিন্তু শিবরতন মিত্র প্রমুখ সাহিত্যিকের অনুসন্ধানের ফলে আরও অনেক আগেকার গদ্য রচনা পাওয়া গিয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেনও তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে অনেক পুরনো বাংলা গদ্য রচনার উল্লেখ করেছেন। এবং তাঁর 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে অনেক পুরনো গদ্য রচনার নমুনাও দিয়েছেন।

বাংলা ভাষায় রমাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণ' এবং চণ্ডীদাসের 'চৈত্যরূপ প্রাপ্তি' রচনার পারিপাট্য হিসেবে উঁচু স্থান পাওয়ার যোগ্য না হলেও প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে এই গ্রন্থগুলির মূল্য অনেক। এই পুস্তকগুলির রচনা দেখলে বেশ বোঝা যায়, যে সময়ে এই পুস্তকগুলি রচিত হয়েছিল, বাংলা গদ্যের আকার তখনও পূর্ণরূপে গঠিত হয়নি। অধিকাংশ ক্রিয়াপদের অভাব। বাক্যগুলোতে তিন-

চারটের বেশির শব্দ নেই। এটাই এই সময়ের রচনার বৈশিষ্ট্য। উনিশ শতকের গদ্যের মতো দীর্ঘ সমাসবদ্ধ বাক্য তখনও বাংলা গদ্যে ব্যবহৃত হয়নি। এজন্যেই মনে করা হয়, এই গ্রন্থগুলি বাংলা গদ্যের প্রকৃত প্রাচীনতম অবস্থার পরিচায়ক।

আমাদের মনে রাখা উচিত, আদিম অবস্থায় এই বঙ্গভাষার পরিপুষ্টির জন্য বৈষ্ণব কবিরা যথেষ্ট অনদান রেখেছেন। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত কিছু সরল ও বিশদ; কৃষ্ণদাসের চৈতন্য চরিতামৃত কিছু কঠিন ও জটিল। কিন্তু এ দুয়েরই ভাষা বিশুদ্ধ বাংলা। রূপগোস্বামীর রিপুদমন বিষয়ে ‘রাগময়কণ’ নামে একটি বাংলা গ্রন্থ রয়েছে। সনাতন গোস্বামীর ‘রসময় কলিকা’ ও জীব গোস্বামীর ‘করচাই’ বাংলায় রচিত। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন, এখানে মাত্র কয়েকজন বৈষ্ণব কবির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

চৈতন্যযুগের রচনার মধ্যে রূপগোস্বামীর ‘কারিকা’ ও ‘রাগময়ী কণা’, নরোত্তম ঠাকুরের ‘আশ্রয় নির্ণয়’ ও ‘দেহ কড়চা’, বৃন্দাবন দাসের ‘গোলক সংহিতা’, কৃষ্ণদাসের ‘আত্মজিজ্ঞাসা’, ‘আত্মনিরূপণ’, ‘স্বরূপ বর্ণন’, ‘ত্রিগুণাত্মিকা’, ‘ব্রজপটল কারিকা’, ‘ক্রিয়ামঞ্জরী’, ‘তত্ত্বনিরূপণ’, ‘জিজ্ঞাসাপত্রী’, ‘সহজ তত্ত্ব’ বা ‘ভক্তি চন্দ্রিক’ প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই গ্রন্থগুলি অধিকাংশই প্রশ্নোত্তর ধরনে রচিত। অলঙ্কার ও শব্দাড়ম্বর কিছু নেই। কিন্তু এই গ্রন্থগুলির ভাষা আগের থেকে উন্নত স্তরের। পুস্তকগুলির প্রত্যেকটি সারগর্ভ এবং উপদেশমূলক। ক্রমবিকাশ রীতি অনুসারে এই গ্রন্থগুলির রচনা আদিযুগের রচনা থেকে ভালো।

দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে এই সহজিয়া সাহিত্য বিষয়ক পুস্তকের একটি সুদীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। তারমধ্যে অনেকগুলিতেই গদ্য রচনা আছে এবং এদের অধিকাংশই প্রায় পাঁচশ বছর আগের রচনা।

এবার আমরা বাংলা গদ্য সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ নিয়ে কথা বলব। এ যুগের রচনার প্রধান লক্ষণ, বাংলার সঙ্গে 'যাবনিক' শব্দের অবাধ সংমিশ্রণ। কী গদ্যে, কী পদ্যে, কী চিঠিপত্রে, কী দলিলে। তবে দলিলে আরবি, ফারসি শব্দের প্রয়োগ আজও বজায় আছে। দলিলের জন্য কিংবা রাজদরবারে যে বাংলা গদ্য ব্যবহৃত হত তা মূলতঃ আরবি, ফারসি এবং সংস্কৃতের সংমিশ্রণ। শিবরতন মিত্রের 'Types of Early Bengali Prose' বইতে ইংরেজ আমলের আগের বহু দলিল, দস্তাবেজ ও চিঠিপত্রের নমুনা রয়েছে।

শোভাবাজারেরে অনাথকৃষ্ণদেব তাঁর 'বঙ্গের কবিতা' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন, 'রামপ্রসাদের বিদ্যু বামনী ও ভারতের হীরামালিনী চরিত্র—কাহারও কাহারও মতে মুসলমানী সাহিত্য হইতে আমদানি। আলিবর্দি সিরাজুদ্দৌলার আমলে বা তাহার কিছু পূর্ব সময় হইতে বাঙালি শিক্ষিত সমাজ যে মুসলমানী আদব কায়দায় অভ্যস্ত এবং ফারসি ভাষায় ব্যুৎপন্ন হওয়া ও সুশিক্ষিত বা কৃতবিদ্য বলিয়া পরিচয় দিবার অঙ্গ মনে করিতেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।'

তখনকার উল্লখযোগ্য পুস্তক ছিল গোলে বকাওয়ালী, লয়লা-মজনু, হাফেজের বয়েৎ, গুলেস্তাঁ, জেলেখা প্রভৃতি। অনাথকৃষ্ণদেব 'জেলেখা' গ্রন্থ থেকে তখনকার বাংলা গদ্যের

নমুনা দেখাচ্ছেন–

‘কে তোমাকে ঠকাইয়াছে বলো, তোমার ফুলের বর্ণ মুখ হরিদ্রার ন্যায় বিবর্ণ কেন? তুমি চন্দ্রের মতো দিন দিন ক্ষয় পাইতেছ কেন? আমি বোধ করি, তুমি কাহারও প্রেমের ফাঁদে পড়িয়াছ। বলো সে কে? যদি সে আসমানের চাঁদ হয়, তবে তাহাকে জমীনে ফেলিয়া তোমার নিকট বন্দী করিব। সে যদি পাহাড়বাসী দেবতা হয়, তবে মন্ত্রবলে তাহাকে শিশিতে পুরিয়া তোমার নিকট হাজির করিব। যদি সে মনুষ্য হয়, তবে তুমি যাহার দাসী হইতে ইচ্ছা করিতেছ, সে আমার কুহকে তোমার দাস হইয়া পদানত হইবে।’

কেদারনাথ মজুমদার তাঁর ‘গদ্যসাহিত্য’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘অতি প্রাচীন তুলট কাগজে লিখিত দেড় পৃষ্ঠায় সমাপ্ত একখানা কাশীর বর্ণনা আমার নিকট আছে। ইহার নমুনা যথা – ‘কাশী বারাণসী বনবাস আনন্দ কানন অভিমুক্ত ধাম মহাশ্মশান বিশ্রামস্থল অর্থাৎ সেহি ক্ষেত্রে শরীর পতন পাইলে পুনশ্চ জন্ম হয় না। মনিকর্ণি সমতীর্থ বিশ্বেশ্বর সমলিঙ্গ নাস্তি ব্রহ্মাণ্ড গোলকে। বহুজন্মার্জিত সকৃতি বস্তু লোকের সেহি ধামে শরীর পতন হয়। অথবা ধাম দর্শন হয়। সেখানে দণ্ডী করিবার এক্তেয়ার দিয়াছেন কালভৈরব ও দণ্ডপানি। এহানরা বেবচারী জীব সকলে ধামে বাস করিতে দেন না।’

এই কাশীর বর্ণনা একটি ভ্রমণ কাহিনি। এই ক্ষুদ্র ভ্রমণ কাহিনির এক জায়গায় লেখা আছে, ‘এহার মাহাত্ম্য পৃথক পৃথক আছে। সকল স্মরণ নাই।’

বৈষ্ণব কবিরা ছন্দে চৈতন্যের ভ্রমণ কাহিনি লিখেছেন।

কিন্তু এই ক্ষুদ্র কাহিনির বিশেষত্ব গদ্যে ও সরলতায়।

১৯২২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত শিবরতন মিত্র-র বই Types of Early Bengali Prose, এতে শিবরতন মিত্র লিখছেন:

By old Bengali Prose is meant here the prose-literature which was produced before the advent of British rule and the establishment of printing press in Bengal and which is therefore in a sense, indigenous and free from the influence of western thought or literature.

Although the bulk of this old literature is in verse, which at one time was almost the universal vehicle of literary expression, the fact is familiar to every student of Bengali literature that there existed a considerable amount of Bengali prose-writing long before the Serampore Missionaries or the pundits of the Fort William college, or even Raja Rammohan Roy, in the early years of the nineteenth century, ever dreamt of 'creating' a general prose-style.

The existence of these specimens of prose-writing will in itself remove the impression, still obtaining in some quarters, that Bengali prose is entirely a creation of the 19th century.

A distinction must be made between old and

modern prose-wring in Bengali and although the former cannot possibly compete as literature, in point of positive achievement with the latter.

The use of Bengal instead of Sanskrit or Persian is a fact significant in itself; but this widening of the scope of prose also indicates that prose was gradually becoming a necessity, as a vehicle of expression, to the life of the nation; and forces were already active towards evolving a general prose-style, not merely literary but suited to the every-day use of the people.

Most of these documents, maybe rejected as non-literary, but there are various phase in the growth old prose=-writing.

May not have been literature in the proper sense; but the small amount of positive achievement should not blind us to its immense formal impression or to the fact that all this indicated a movement towards better and better prose-writing and the gradual evolution of an indigenous prose style.

'বাংলা শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের 'ভাষার কথা' (১৩২৩) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশির ফরমাশে এবং তার সূত্রধর হইলেন সংস্কৃত পন্ডিত, বাংলা ভাষার সঙ্গে যাদের ভাসুর ভাদ্র বউয়ের সম্বন্ধ। তাঁরা এ ভাষার কখনো মুখদর্শন করেন নাই। এই সজীব ভাষা তাঁদের

কাছে ঘোমটার ভিতরে আড়ষ্ট হইয়া ছিল, সেইজন্য ইহাকে তাঁরা আমল দিলেন না। তাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের হাতুড়ি পিটিয়া নিজের হাতে এমন একটা পদার্থ খাড়া করিলেন যাহার কেবল বিধিই আছে কিন্তু গতি নাই। সীতাকে নির্বাসন দিয়া যজ্ঞকর্তার ফরমাশে তারা সোনার সীতা গড়িলেন।

যদি স্বভাবের তাগিদে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হইত, তবে এমন গড়াপেটা ভাষা দিয়া তার আরম্ভ হইত না। তবে গোড়ায় তাহা কাঁচা থাকিত এবং ক্রমে ক্রমে পাকা নিয়মে তার বাধন আঁট হইয়া উঠিত। প্রাকৃত বাংলা বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে প্রয়োজনমত সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডার হইতে আপন অভাব দূর করিয়া লইত।

কিন্তু বাংলা গদ্য-সাহিত্য ঠিক তার উল্টা পথে চলিল। গোড়ায় দেখি তাহা সংস্কৃত ভাষা, কেবল তাহাকে বাংলার নামে চালাইবার জন্য কিছু সামান্য পরিমাণে তাহাতে বাংলার খাদ মিশাল করা হইয়াছে। এ একরকম ঠকানো।'

ওই প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'আজ পর্যন্ত বাংলা গদ্য, সংস্কৃত ভাষার বাধা ভেদ করিয়া, নিজের যথার্থ আকৃতি ও প্রকৃতি প্রকাশ করিবার জন্য যুঝিয়া আসিতেছে।

অল্প মূলধনে ব্যাবসা আরম্ভ করিয়া ক্রমশ মুনাফার সঙ্গে সঙ্গে মূলধনকে বাড়াইয়া তোলা, ইহাই ব্যাবসার স্বাভাবিক প্রণালী। কিন্তু বাংলা-গদ্যের ব্যাবসা মূলধন লইয়া শুরু হয় নাই, মস্ত একটা দেনা লইয়া তার শুরু। সেই দেনাটা খোলসা করিয়া দিয়া স্বাধীন হইয়া উঠিবার জন্যই তার চেষ্টা।'

'যদি পণ্ডিতমশায়দের এই রায়ই পাকা হয় যে, সংস্কৃত ভাষায় মহামহোপাধ্যায় না হইলে বাংলা ভাষায় কলম ধরা ধৃষ্টতা তবে যাদের সাহস আছে ও মাতৃভাষার উপর দরদ আছে, প্রাকৃত বাংলার জয়পতাকা কাঁধে লইয়া তাঁদের বিদ্রোহে নামিতে হইবে। ইহার পূর্বেও 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতির মতো বই বিদ্রোহের শাঁখ বাজাইয়াছিল।'

বাংলাভাষা চর্চার মতো বাংলা গদ্যচর্চার ধারাবাহিকতায় রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছেন ইংরেজি শিক্ষার অব্যাহত কুফল। তাঁর মতে এই সংকট থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রও রেহাই পাননি।

'বাংলা কথ্যভাষা' (১৩৫০) প্রবন্ধে বাংলা গদ্যচর্চার গোড়ার দিকের সংকট নিয়ে কথা বলেছেন তিনি। 'যখন বাংলাভাষায় গদ্যসাহিত্যের অবতারণা হল তার ভার নিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। দেশের ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে প্রতিদিন যে গদ্যবাণী প্রবাহিত হচ্ছে তাকে বহুদূরে রেখে সংস্কৃত সরোবর থেকে তাঁরা নালা কেটে যে ভাষার ধারা আনলেন তাকেই নাম দিলেন সাধুভাষা। বাংলা গদ্য সাহিত্যিক ভাষাটা বাঙালির প্রাণের ভেতর থেকে স্বভাবের নিয়মে গড়ে ওঠেনি– এটা ফরমাশে গড়া। ...বঙ্কিমের সেই দুর্গেশনন্দিনীর ভাষাও আজ প্রায় মরা গাঙের ভাষা হয়ে এসেছে– এখনকার সাহিত্যে ঠিক সেই ভাষার স্রোত চলছে না।'

সাহেব-পণ্ডিতের যোগসাজশে তৈরি বাংলা গদ্য যে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে তা তিনি উপলব্ধি করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।

ভাষার অবিমিশ্র কৌলীন্য নিয়ে খুঁৎখুঁৎ করেন এমন গোঁড়া লোক আজও আছেন। কিন্তু ভাষাকে দুইমুখো করে তার দুই বাণী বাঁচিয়ে চলার চেষ্টাকে অসাধু বলাই উচিত। ভাষায় এরকম কৃত্রিম বিচ্ছেদ জাগিয়ে রেখে আচারের শুচিতা বানিয়ে তোলা পুণ্যকর্ম নয়, এখন আর এটা সম্ভবও হবে না।

সুনীতিকুমার বলেন খৃষ্টীয় দশম শতকের কোনও-এক সময়ে পুরাতন বাংলার জন্ম। কিন্তু ভাষার সম্বন্ধে এই 'জন্ম' কথাটা খাটে না। যে জিনিস অনতিব্যক্ত অবস্থা থেকে ক্রমশ ব্যক্ত হয়েছে তার আরম্ভসীমা নির্দেশ করা কঠিন। দশম শতকের বাংলাকে বিংশ শতকের বাঙালি আপন ভাষা বলে চিনতে পারবে কি না সন্দেহ। শতকে শতকে ভাষা ক্রমশ ফুটে উঠেছে, আধুনিক কালেও চলছে তার পরিণতি। নতুন নতুন জ্ঞানের সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে, রীতির সঙ্গে, আমাদের পরিচয় যত বেড়ে চলেছে, আমাদের ভাষার প্রকাশ ততই হচ্ছে ব্যাপক। গত ষাট বছরে যা ঘটেছে দু-তিন শতকেও তা ঘটেনি।

বাংলা ভাষার কাঁচা অবস্থায় যেটা সবচেয়ে আমাদের চোখে পড়ে সে হচ্ছে ক্রিয়া-ব্যবহার সম্বন্ধে ভাষার সংকোচ। সদ্য-ডিম-ভাঙা পাখির বাচ্চার দেখা যায় ডানার ক্ষীণতা। ক্রিয়াপদের মধ্যেই থাকে ভাষার চলবার শক্তি। রূপগোস্বামীর লেখা কারিকা থেকে পুরনো বাংলা গদ্যের একটু নমুনা দেখলেই এ কথা বুঝতে পারা যাবে–

প্রথম শ্রীকৃষ্ণ গুণ নির্ণয়। শব্দগুণ গন্ধগুণ রূপগুণ রসগুণ স্পর্শগুণ এই পাঁচগুণ। এই পঞ্চগুণ শ্রীমতি রাধিকাতেও বসে। পূর্বরাগের মূল দুই হঠাৎ শ্রবণ অকস্মাৎ শ্রবণ।

‘ভাষার কথা’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, ‘বাংলাকে সংস্কৃতের সন্তান বলিয়াই যদি মানিতে হয় তবে সেইসঙ্গে এ কথাও মানা চাই যে তার ষোলো বছর পার হইয়াছে, এখন আর শাসন চলিবে না, এখন মিত্রতার দিন। কিন্তু যতদিন বাংলা বইয়ের ভাষা চলিত ভাষার ঠাট না গ্রহণ করিবে ততদিন বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার সত্য সীমানা পাকা হইতে পারিবে না। ততদিন সংস্কৃত বৈয়াকরণের বর্গির দল আমাদের লেখকদের ত্রস্ত করিয়া রাখিবেন। প্রাকৃত বাংলার ঠাটে যখন লিখিব তখন স্বভাবতই সুসংগতির নিয়মে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব বাংলা ভাষার বেড়া ডিঙাইয়া উৎপাত করিতে কুণ্ঠিত হইবে।’

পুঁজিবাদী সমাজের অন্যতম ক্লেদ হল, পুরনো সময়কে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হওয়া এবং তা পূর্ণতঃ বাদ দেওয়া। কথাটা বাণীর মতো শোনালেও এর সত্যতা বহুবার প্রমাণিত। বিস্মরণের সংস্কৃতি। আমরা কেউ এর বাইরে নই।

বিস্মরণের সংস্কৃতিঃ নমুনা ১ঃ

সজনীকান্ত দাস তাঁর ‘বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস’ বইতে

লিখছেন, 'প্রাচীনতম বাংলা চর্যাপদকে যদি ৯৫০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি রচিত বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে এখন পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের যতটুকু জ্ঞান জন্মিয়াছে তাহাতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি– সাহিত্য পদবাচ্য না হইলেও উল্লেখযোগ্য বাংলা গদ্য ইহার ঠিক ৮৫০ বৎসর পরে, ১৮০১ খৃস্টাব্দে রামরাম বসু কর্তৃক রচিত ও শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত হয়। অর্থাৎ খৃস্টীয় ঊনবিংশ শতকের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা গদ্যের যথার্থ সূত্রপাত।'

বিস্মরণের সংস্কৃতি: নমুনা ২:

'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' বইতে সুকুমার সেন শুরুতেই বলছেন, 'পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্যের কোনও স্থান ছিল না।' ১৩৪১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থে সুকুমার সেন আরও বলছেন, ''তখনকার দিনে লেখাপড়ার কাজে গদ্যের প্রয়োগ ছিল শুধু চিঠিপত্রাদিতে ও দলিল দস্তাবেজে।'

O কিন্তু ১৫৫৫ নাগাদ কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের লেখা চিঠির উল্লেখ করতে গিয়ে সুকুমার সেন স্বীকার করছেন, 'ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে সাধুভাষার রূপ বাঙ্গালা গদ্যে একরকম দাঁড়াইয়া গিয়াছে।' এমনকি ষোড়শ শতকের শেষার্দ্ধে পর্তুগিজ পাদ্রিদের বাংলা দেশে আগমন এবং রোমান অক্ষরে তাঁদের রচিত খৃস্টানি বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেও তিনি বলছেন, 'তখনকার দিনে বাঙ্গালা সাধুভাষায় গদ্যের একটা মোটামুটি কাঠামো খাড়া হইয়া গিয়াছে।'

O অষ্টাদশ শতকের গদ্যের ভাষা জটিলতা পূর্ণ হলেও, যখন কথ্যভাষাকে অনুসরণ করে লেখা হত, তখন তাতে জটিলতা

থাকত না। অষ্টাদশ শতকে লেখা একটি গল্প বা উপকথায় সেই সময়ের বাংলা কথা ভাষামূলক গদ্যের একটি অবিকৃত রূপ পাওয়া যায়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বাংলা কাগজপত্র ঘেঁটে এই গল্পটি উদ্ধার করেছিলেন।

সেই গল্পের শুরুর কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—

'মোকাম ভোজপুর শ্রীযুত ভোজরাজা, তাহার কন্যা শ্রীমতি মৌনাবতী, ষোড়শ বরিস্যা, বড় সুন্দরী, মুখ চন্দ্রতুল্য, কেশ মেঘের রঙ্গ, চক্ষু আকর্ণ পর্যন্ত, যুগ্ম ভ্রূ, ধনুকের ন্যায় ওষ্ঠ রক্তিম বর্ণ, হস্ত পদ্মের মৃণাল, স্তন দাড়িম্ব ফল, রূপলাবণ্য বিদ্যুৎছটা, তার তুলনা আর নাঞ্ৰী এমন সুন্দরী। সে কন্যার বিবাহ হয় নাঞ্ৰী। কন্যা পণ করিয়াছে রাত্রের মধ্যে জে কথা কহাইতে পারিবেক, তাহাকে আমি বিভা করিব। একথা ভোজরাজা সুনে বড় বড় রাজার পুত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেক, এক এক রাজার পুত্রকে এক এক দিন। রাত্রের মধ্যে এক এক জনকে শয়ন ঘরে লইয়া শয়ন করায়। সে ঘরে আর কেহো থাকে না, কেবল কন্যা আর রাজপুত্র। এক খাটে কন্যা সোয়ে এক খাটে রাজপুত্র সোয়ে। জে রাজপুত্র যেমন জ্ঞানবান হয়, সে সেইরূপ কথা সারারাত্র কহে। কন্যাকে কথা কহাইতে পারিলেক না, কতমৎ প্রকার করিলেক তবু কন্যহাকে কথা কহাইতে পারিলেক না। এইরূপে অনেক দিন গেল পরে রাজা বিক্রমাদিত্য কন্যার রূপগুণ শুনে বড়ই তুষ্ট হইলেন। কাহাকেও কহিলেন না, সঙ্গে একজন মনুষ্য লইলেন না, কেবল আপুনি এক বড় ঘোড়ায় আরোহণ হইয়া সিকারের নাম করিয়া দুই চারি রোজের পরে মোকাম ভোজপুর শ্রীযুত ভোজরাজার বাটীতে উপস্থিত হইলেন।'

যে কাগজে গল্পটি পাওয়া গিয়েছে, তাতে কোনও সন তারিখ না থাকলেও হস্তলিপি দেখে এবং ভাষার আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, রচনাটি অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝির এদিকে নয়।

O গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এক সম্প্রদায় নিজেদের সাধনপ্রণালীর উপর বই লিখতেন। প্রথমে এই রকম বই পদ্যে লেখা হত। পরে, সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের শেষ থেকে গদ্যে বা মিশ্র গদ্যেপদ্যে এই পুঁথিগুলি লেখা হত। গদ্যে লিখিত এইসব গূঢ়তত্ত্ব সংবলিত পুস্তক গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তর রূপে রচিত। বাক্য ছোট ছোট, ক্রিয়াপদ প্রায়ই উহ্য। বাক্যের পদের পারম্পর্য অনেক সময় বিপর্যস্ত দেখা যায়, তার কারণ অজ্ঞান বা অক্ষমতা নয়। গদ্যের ভেতর পদ্যের ছন্দ বা তাল আনার চেষ্টা। যেমন–

'মানুষের আচার ব্যবহার ছাড়িলে ঈশ্বর ছাড়া হয়। তবে ঈশ্বর মানুষের আশ্রয় কয়। ঈশ্বর সে মানুষের বশ। ইহা কেহো নাই জানে।'

এই বৈষ্ণব সাধকদের লেখায় অসমাপিকার অপপ্রয়োগ নেই। একাধিক বাক্য সংযোজক অব্যয়ের দ্বারা যুক্ত থাকে বটে, কিন্তু সরল বাক্যের প্রয়োগও নিতান্ত অল্প নয়। ক্রিয়াপদের মধ্যে শুধু ভবিষ্যৎ কালের রূপে কিছু কিছু আধুনিক রূপ পাওয়া যায়। বিদেশি শব্দের প্রয়োগ নেই বললেই হয়। তৎসম শব্দের প্রাচুর্য থাকলেও ভাষা আড়ম্বর পূর্ণ অথবা দুর্বোধ্য নয়। বরং গাম্ভীর্যময় ও ওজস্বী।

এইরকম একটি গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি–

'অজ্ঞানী জীবে কহে এখন বুঝিলাম কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞান ইন্দ্রিয় বিনে কেবল মনের মধ্যে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারেন না এবং মন বিনে কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞান ইন্দ্রিয় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারেন না। ইহা সত্য বুঝিলাম তাহার কারণ কহি। যখন মনের সহিত কর্ণাদি জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের যোগ হয় তখন আকাশ ভূতের শব্দগুণ জ্ঞান করেন। অতএব কর্ণ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারেন না এবং যখন মনের সহিত চর্ম জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের যোগ হয় তখন বায়ুভূতের স্পর্শগুণ জ্ঞান করেন অতএব চর্ম জ্ঞান ইন্দ্রিয়ে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারেন না।'

এই রচনাটিতে দেখা যাচ্ছে, অষ্টাদশ শতকের মধ্য ভাগেই বাংলায় সাধু ভাষার গদ্যরীতি সাধারণ ও প্রাত্যহিক ব্যবহারের উপযুক্ত হয়েছিল।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাইরে এবং পণ্ডিতদের সাহায্য ছাড়াও যে বাংলায় গদ্য সাহিত্যের অস্তিত্ব এবং প্রচলন ছিল তার একটি প্রমাণ দিচ্ছি। এই পুঁথিতে রামায়ণের কাহিনি (অযোধ্যা প্রত্যাগমন পর্যন্ত) সুন্দর সাধুভাষায় বর্ণিত আছে। অনুমান করা হয় পুঁথিটি উনিশ শতকের প্রথম পাদের এদিকে নয়। সম্ভবত অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বে লেখা।

পুঁথিটির ভাষার নমুনা হিসেবে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—

'ধনুর্ভঙ্গকালে সীতার উৎসাহবর্ধন কারণ রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণ এই বাক্য কহিতেছেন। প্রভু! রঘুনাথ বহুতর চিন্তাতে কিঞ্চিৎ আবশ্যক নাই তুমার দাস আমি সম্মুখে বিদ্যমান আছি। যদ্যপি

কৃপাপূর্বক অনুমতি হয় তবে সুমেরু প্রভৃতি যে পর্বত তাহাকে গণনা করি না। অতএব জীর্ণ শিবধনুকে উত্থাপন করা চালন করা নম্র করা ভগ্ন করা আশ্চর্য নহে প্রভু।

তদনন্তর ক্রোধযুক্ত হইয়া পরশুরাম রামচন্দ্রের প্রতি কহিতেছেন যে ওরে রামচন্দ্র তুই ভগবান স্বরূপ অতএব তুর সহস্র হস্ত হইয়াছে আমার হস্ত দ্বয় তুই মহারাজ আমি মুনির সন্তান তুর সৈন্যগণ নিকটে বিদ্যমান আছে আমি একক হইয়াছি তথাপি তুর সহিত আমার সংগ্রাম হক সূর্যদেব দর্শন করুন।'

সাহিত্যিক গদ্য রচনার প্রচেষ্টা উনবিংশ শতকের গোড়া থেকে শ্রীরামপুরের খৃস্টান মিশনারিদের উদ্যোগে ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আশ্রয়ে নতুন করে আরম্ভ হয়। যাঁরা এই নতুন গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি করলেন, তাঁদের কাছে আগের শতকের বৈষ্ণব গদ্য সাহিত্য সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত ছিল। সেই কারণে হয় তাঁদেরকে সংস্কৃত বা ইংরেজির আদর্শ নিতে হল, অথবা নিজের মনগড়া ছাঁদে সংস্কৃত, আরবি-ফারসি, সাধুভাষা ও কথ্যভাষার খিচুড়ি করে এক অদ্ভুত গদ্যের সৃষ্টি করতে হল। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে যে সাহিত্যে গদ্যের সম্পূর্ণ রূপ উদ্ভূত হয়েছিল তা বৈষ্ণবদের নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ থাকায় সাধারণ শিক্ষিত ও 'ভদ্র' সমাজের নজরে পড়েনি।

উনিশ শতকের শুরুতে আমরা দেখছি রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ১৮০১ সালে শ্রীরামপুর থেকে ছেপে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের ভাষা বড়ই অদ্ভুত। তৎসম শব্দের অনেক ব্যবহার রয়েছে। কিন্তু সেগুলো অপপ্রযুক্ত ও বানানদুষ্ট। তদ্ভব শব্দকে অনেক সময় ভ্রান্ত তৎসম রূপ দেওয়া

হয়েছে। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'-এর দুর্বোধ্যতার প্রধান কারণ, বিধেয়বিশেষণ, কর্ম ও সম্প্রদান কারক এবং অসমাপিকা ক্রিয়াপদ সংবলিত বাক্যাংশের ক্রিয়াপদের পরে প্রয়োগ। কর্তৃপদও অনেক সময় ক্রিয়াপদের পরে বসেছে। বাক্যের মধ্যে অসংপৃক্ত বাক্যান্তরের প্রয়োগ উনিশ শতকের প্রথম পাদের বাংলা গদ্যের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল বটে, কিন্তু এর প্রয়োগ রামরাম বসুর বইতে এত বেশি করা হয়েছে যে, পাঠককে দিশেহারা হতে হয়। রামরাম বসুর বইতে দেখা যভাষা সরলতর হয়নি, বরং আরও বেশি করে জট পাকিয়েছে। ১৮০১ সালে কেরি সাহেবের 'কথোপকথন'-ও প্রকাশিত হয়। মোটের ওপর বলতে গেলে এতে জটিলতা আদৌ নেই। 'কথোপকথন' প্রকাশের ১১ বছর পরে ১৮১২ সালে কেরির 'ইতিহাসমালা' প্রকাশিত হয়। এর ভাষা সরল হলেও আগের বইয়ের মতো নয়। এতে সাধুভাষার প্রতি কেরির ক্রম বর্ধমান পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। সুকুমার সেন বলছেন, এর কারণ বোধহয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আবহাওয়া। কেননা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচনাতেও দেখা যায় আগের বইয়ের থেকে পরের বইতে সাধুভাষার প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং সে-কারণে ভাষার কৃত্রিমতা এবং জটিলতা ক্রমশঃ বেড়েছে। গোলোকনাথ শর্মার হিতোপদেশের বঙ্গানুবাদও ১৮০১ সালে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের বাক্য বিন্যাস রীতি হুবহু সংস্কৃতের অনুযায়ী।

বাংলা গদ্যের এই সংস্কৃতকরণের বিষয়ে বলতে গিয়ে সজনীকান্ত দাস লিখছেন, '১৭৭৮ খৃস্টাব্দে হ্যালহেড এবং পরবর্তীকালে হেনরি পিটস ফরস্টার এবং উইলিয়াম কেরী বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত জননীর সন্তান ধরিয়া আরবি-ফারসির অনধিকার

প্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালতি করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই তিন ইংলন্ডিয় পণ্ডিতের চেষ্টায় অতি অল্প দিনের মধ্যে বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৭৮ খৃস্টাব্দে এই আরবি-ফারসি নিধন যজ্ঞের সূত্রপাত এবং ১৮৩৮ খৃস্টাব্দে আইনের সাহায্যে কোম্পানির সদর মফস্বল আদালত-সমূহে আরবি-ফারসির পরিবর্তে বাংলা ও ইংরেজি প্রবর্তনে এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি।' ১৭৭৮ থেকে ১৭৯৯–এই ২১ বছরে নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড, জোনাথান ডানকান, নিল বেঞ্জামিন এডমনস্টোন, হেনরি পিটস ফরস্টার, এ আপজন এবং জন মিলার–আধুনিক বাংলা গদ্যের ভিত্তিপত্তনে এই ছ' জন ইংরেজের ভূমিকা স্মরণ করতে শেখায় আমাদের তথাকথিত 'নবজাগরণ'।

অতিরিক্ত পাঠ

১। ফাদার দ্যতিয়েন (সংকলন) - গদ্যপরম্পরা

২। দেবেশ রায় - উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সামাজিক গদ্য

৩। সুকুমার সেন - বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য

৪। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - পুরাতন গদ্যগ্রন্থ সংকলন

৫। আশিস খাস্তগীর - উনিশ শতকের বাংলা ছাপাখানা

৬। ব্রজেন্দ্রনাথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত

৭। স্বপন চক্রবর্তী (সংকলন) - মুদ্রণের সংস্কৃতি ও বাংলা বই

৮। Anindita Ghosh - Power in print - Popular publishing and the politics of language and culture in a colonial society, 1778-1905

৯। Sisir Kumar Das - Sahib and munshis : an account of the college of fort William

১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার প্রকল্প

জনদানে প্রকল্প পরিচালনা

১। ১৭৭০ এবং...
মিল্টন বিশ্বাস এবং দেবোত্তম চক্রবর্তী সম্পাদিত
অক্ষরযাত্রা প্রকাশনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে 'পলাশীর প্রান্তরে আজ...' শীর্ষকে প্রকাশিত

২। টেগোর ল্যান্ড ঠাকুর কলোনি প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য এবং তীর্থরাজ ত্রিবেদী
রবিবাবুর শিক্ষা চিন্তায় ঔপনিবেশিক ভদ্রবিত্তীয় প্রদূষণ এবং তিনি যে জ্ঞান আর শ্রমের মিলিত শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করেছিলেন নিজের ছেলে আর লক্ষ্মীশ্বর সিংহকে বিদেশে পাঠিয়ে, শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করে, সেই প্রক্রিয়াকে সাবোতাজ করার ইতিহাস আমরা খুঁজছি। নব্য শান্তিনিকেতনি ভাবনাচিন্তার বিরোধিতার কেন্দ্রে আছেন স্যর যদুনাথ সরকার - তিনি ব্রিটিশ আঙ্গিক অনুসরণে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থার গোটা ভাবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। মূলত কয়েকটি বিখ্যাত শান্তিনিকেতনি আশ্রমিক পরিবার রবীন্দ্রনাথকে ঠাকুর বানিয়ে যদুনাথ সরকারের ভাবনাকে সামনে রেখে ভদ্রবিত্ত ঔপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামো শান্তিনিকেতনে চাপিয়ে দিয়েছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নামিয়ে আনার উদ্যম নিয়েছে যাতে তাদের সন্তানেরা চাকরি করার সুযোগ পায়। এক বিখ্যাত পত্রিকা সম্পাদক রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে কেজি টু পিজি প্রকল্প চালু করেছেন এবং এটা ১৯৪১-এর পরে উদ্দাম গতিতে চলেছে, দেশজ মানুষকে উচ্ছেদ করে, তাদের ওপর পরজীবি ভদ্রবিত্তের উপনিবেশ চাপিয়ে দিয়েছে, ঘেটোয় থাকতে বাধ্য করেছে, মিউজিয়ামের মত খোয়াইয়ে হাটে তাদের শোকেস করাচ্ছে। আমাদের কাজ এই সব অভিচারের মূলে পৌঁছনোর।
সময় লাগবে ৮ থেকে ১০ মাস।
আনুমানিক ব্যয় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা

৩। হকার ব্যবস্থা নিয়ে প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য
রেল হকার, পথ হকার নিয়ে অনেকগুলো সমীক্ষা। একটা সমীক্ষা অপ্রচলিত পত্রিকায় প্রকাশিত। শক্তিমান ঘোষের সাক্ষাৎকার নেওয়া চলছে। অন্তত ৩টে বই-এর পরিকল্পনা।
সময় ১ বছর
আনুমানিক ব্যয় ২ লক্ষ টাকা

৪। ক্যাডার কয়েদি
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য
স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্রমিকভাবে কেবলমাত্র রাজনৈতিক কর্মীদের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে কোনো সংকলন তৈরী হয়নি। তাই এই সম্পাদিত সংকলনের পরিকল্পনা - যাতে একইসঙ্গে, অনুবাদ, পুনর্মুদ্রণ এবং সাক্ষাৎকার থাকবে। সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য কমিউনিস্ট চিরকালীন অসুখ/সমস্যা/আমলাতন্ত্র, ভদ্রলোকামি, তথাকথিত 'নিচুতলার' কথা না শুনে, নিজেদের কেন্দ্রীয় কমিটির/ পলিটব্যুরোর বক্তব্য চাপিয়ে দেওয়া [গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা], এবং সেই সিদ্ধান্তগুলির পরিণতি হিসাবে বাম-অবাম-আন্দোলনের অবক্ষয়কে চিহ্নিত করা। সর্বোপরি সিপিআইএম, সিপিআই ও নকশালগোষ্ঠী, ট্রটস্কিপন্থী, গান্ধীবাদী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ'র কিছু জীবিত পুরাতন কর্মীর বয়ান নথিভুক্ত করা- যাতে ক্রনোলজিক্যালি নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিতে নয়, কর্মীদের চোখে বাংলায় বাম-আন্দোলনের ইতিহাসকে- বৈশ্বিক ও জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে আজ পুনরায় বিবেচনা করা এই সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য হবে।

৫। বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস
গবেষণা প্রধান কারিগর মহুয়া লাহিড়ী
বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস লেখার কাজ নিয়ে এগোচ্ছেন। লেখা এগোচ্ছে। নতুন কিছু সূত্র পেয়েছেন। সেই সূত্রগুলো নিয়ে আরও কাজ করা দরকার। উনি কলকাতা থাকাকালীন একবার দুবার বৈঠক হবে।

৬। বৃহত্তর বাংলার হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা
গবেষণা নেতৃত্ব চন্দন মুখার্জী, অত্রি ভট্টাচার্য
কারিগর ব্যবস্থার অবস্থা আর কর্পোরেট আগ্রাসন বুঝতে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা। পশ্চিমবঙ্গের চারটে ভৌগোলিক অঞ্চল রাঢ় বাংলা, গাঙ্গেয় উপত্যকা, মধ্য বঙ্গ এবং তরাই অঞ্চলের মোট ১০টা হাট। বাংলাদেশেরও মোট ১০টা হাট সমীক্ষা করার পরিকল্পনা আছে।
সময় অন্তত ১ বছর, হয়ত আরও একটু বেশি
প্রকল্প ব্যয় ১,০০,০০০

৭। মন্দির গবেষকদের কাজের নথিকরণ আর হুগলীর টেরাকোটা মসজিদ মাজার সমীক্ষা
এই মুহূর্তে মন্দির/মাজার গবেষক আছেন, তাদের কাজগুলোকেই নথিকরণ করা হবে।
ইন্দ্রনীল মজুমদারের নেতৃত্ব

দান দেওয়ার জন্যে
জ্ঞানগঞ্জ অছি সবে নথিবদ্ধ হয়েছে, ব্যাঙ্ক-একাউন্ট হয় নি। আপাতত আমরা বন্ধু কারিগর সংগঠন কলাবতী মুদ্রার অছিতে দান নিচ্ছি।

Kalaboti Mudra,
bank of india, J N Road Branch,
A/C - 402620110000228, IFSC - bkid 0004026

ফারসি ভাষায় গঞ্জ অর্থে সম্পদ। মুঘল আমলে খেলা ছিল - গঞ্জ; আওরঙ্গজেবের ব্যবসায়ী জাহাজের নাম ছিল গঞ্জ কি সওয়ারি। আমরা ছোটলোকের রাজনীতি করারা, পুঁজি বাদ দিয়ে বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থা চালানো মুখমণ্ডলহীনেরা, জ্ঞানকেই সম্পদ মানি। সেই জ্ঞান সূত্রে অর্জন করা দক্ষতাই আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি জীবধারণের ভিত্তি, যে জ্ঞান, যে দক্ষতা চর্মচক্ষে অদৃশ্য, ত্বকে মোড়া হাতে অবাঙমানসগোচর; আমরা যারা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকারা, আমাদের একক কারখানায় উৎপাদনের মধ্যে দিয়ে জ্ঞান আর দক্ষতা অধ্যয়ন করি, ফি বাজারে হাটে নিয়মিত ক্রেতার সামনে পরীক্ষা দিই, প্রতি পরীক্ষার ফল নিজে নিজে তুল্য করে নিজেকে আরও একটু জ্ঞানী, দক্ষ করে কারখানা আর তার পরিবেশ, কাজের পদ্ধতিকে আরও কিছুটা পরিবর্তন করে আবার বাজারে, সমাজের সামনে পরীক্ষা দিতে যাই, জ্ঞান অর্জন করি আলাপের মাধ্যমে - কারিগর হকার চাষীর এ এক অনন্ত শিক্ষা চক্র - জ্ঞানগঞ্জ। জ্ঞানগঞ্জই কারিগর-হকার-চাষী উৎপাদন ব্যবস্থার অক্ষদণ্ড, সে জ্ঞান বুকে, মাথায় জায়মান। আমরাই তারই বাহক।

জ্ঞানগঞ্জ তত্ত্ব

জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা বৌদ্ধিক জ্ঞানচর্চার আকাশ কুসুম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে চায় নি, চেয়েছে চরম বিতর্কিত, প্রায় অনালোচিত বিষয় - উপনিবেশের হাতে তৈরি মুসলমান বিদ্বেষ, বাংলা সাহিত্যে বা সিনেমায় কতটা নগ্ন, সে তথ্য বুঝতে; প্রায় অনালোচ্য ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়ে আলোচনার স্ফুলিঙ্গ তৈরি করতে; উপনিবেশের প্রায় অজানা মুঘল জেন্ডার ফ্লুইডিটি তুলে ধরে জ্ঞানচর্চায় উপনিবেশিক স্থিতিশীলতা ভাঙতে; হকার কারিগর চাষীদের পরিকল্পনায় দেশজ উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় নিজেদের জড়িয়ে নিতে; উপনিবেশ বিরোধী চর্চায় পূর্ব অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে আমাদের কী করা উচিৎ নয় এবং কী করা উচিৎ সে আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছি আদিত্য নিগমের সঙ্গে; খুনি গণহত্যাকারী লুঠেরা ব্রিটিশ উপনিবেশিক রাষ্ট্রনির্মাণ আর তার স্থিতিশীলতা এবং প্যাক্স ব্রিটানিকা প্রকল্পে আর্যতত্ত্ব আর ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা কি ছিল বুঝতে চেয়েছে; দেখেতে চেয়েছে কিভাবে হোয়াটসেপ বাহন হয় মিথ-মিথ্যের পাঠক্রমের; একই সঙ্গে দেখতে চেয়েছে কিভাবে বাঙালি প্রখ্যাতরা বাংলায় দাঁড়িয়ে হিটলারের দোসর হয়; একই সঙ্গে বুঝতে চেয়েছে বাংলার নৌকোকে; উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্প বোঝার সম্মেলনের প্রতিবেদনও প্রকাশ করেছে; মণিপুরের বর্তমান আর সামগ্রিকভাবে উত্তর-পূর্বের ইস্যুগুলো বুঝতে চেষ্টা করেছে সাংবাদিক সুবীর ভৌমিকের বয়ানে; চলতি পুথিতে বোঝার চেষ্টা করছে উপনিবেশিক হিন্দু আইন নির্মাণে, সামাজিক আচারের ও শাস্ত্রীয় লিখন-ঐতিহ্যের প্রভাবে প্রায়োগিক দ্বৈততার আগমনের উপর ভিত্তি করে নীতিকাঠামো নির্মাণের দিকচিহ্নগুলি, উপনিবেশের নয়া গার্হস্থ্য নির্মাণের প্রণালী তৈরি হয়ে পলাশীর তিন দশকেই বঙ্গ মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার হরণ ক্রিয়া সমাপ্ত হয়।

জ্ঞানগঞ্জ প্রকাশনা

১। টডের তরবারি
২। জি-২০ ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ
৩। *আপাতত বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে*
৪। হকার চাষী কারিগর ব্যবস্থা
৫। পলাশী থেকে প্যালেস্টাইন
৬। পুথি মুঘল আমলে খোজা - উপনিবেশপূর্ব সময়ের রাষ্ট্র-সমাজে জেন্ডার ফ্লুইডিটি
৭। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)' - আদিত্য নিগমের সঙ্গে আলাপচারিতা
৮। হেথা আর্য, হেথা অনার্য: উপনিবেশ দখলে আর্যতত্ত্বের ভূমিকা ও ভদ্রবিত্ত ব্রাহ্মসমাজ
৯। হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়_মিথ ও মিথ্যার পাঠক্রম
১০। নাজি নাগপাশে ভদ্রবিত্ত
১১। বালথাজার সলভিনসের বাঙলার নৌকো
১২। 'দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে' উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রথম সম্মেলন ২, ৩, ৪ মে, ২০২৪ সমীক্ষা
১৩। অনন্ত লুঠের বাখান
১৪। হিরণ্য একাত্তর
১৫। কেমন আছ মণিপুর
১৬। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না) - নন্দিনী ভট্টাচার্য পাণ্ডার সাক্ষাৎকার
১৭। কৃষি পরাশর
১৮। চলতি প্রাক্-ঔপনিবেশিক অধরা বাংলা গদ্য: একটি অন্বেষণ

জ্ঞা ন গ ঞ্জ